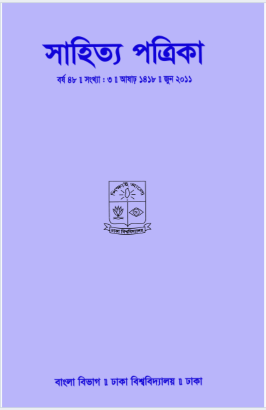

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

৷সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের যুগবাণী: আঙ্গিক বিবেচনার নব প্রস্তাবনা

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tashrik-E-Habib
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.8
Pages	১৩১-১৫৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নজরুলের *যুগবাণী* : আঙ্গিক বিবেচনার নব প্রস্তাবনা

Check for updates

তাশরিক-ই-হাবিব*

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) বিচিত্রমাত্রিক সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপেক্ষিত-অবহেলিত সাহিত্যরূপটি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রবন্ধ। কবি হিসেবে যিনি সাধারণ পাঠক ও বোদ্ধাজন, বিজ্ঞ সমালোচকমহলের নিকট থেকে 'বিদ্রোহী কবি', 'জাতীয় কবি', 'যুগকবি', 'রবীন্দ্র-যুগের প্রথম মৌলিক কবি', 'বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ-প্রবর্তক কবি', 'জাতীয় মহাকবি'সহ অসংখ্য বিশেষণে-অভিধায় পরিস্নাত, তিনি-ই যে প্রবন্ধের শিল্পমান সৃষ্টিতে অতি সাধারণ ও নগণ্য — এরূপ বিভ্রান্তিমূলক ধারণা পোষণের জন্য তাঁর সচেতন পাঠককে অধিক কায়-ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। কারণ, নজরুলের জীবনী ও সাহিত্য-মূল্যায়ন বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের 'সূচি'-অংশে দৃষ্টিপাত করলেই এ সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব। কবি হিসেবে তিনি খুব দ্রুতই বাঙালি-মানসের অশেষ বন্দনা ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছেন এবং তাঁকে নিয়ে রচিত বিবিধ গ্রন্থের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। অথচ তাঁর রচিত প্রবন্ধের শিল্পমান বিবেচনা প্রসঙ্গে সমালোচকমহল বিস্ময়করভাবে নীরব। এর অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু গৎবাঁধা ধারণা বলবৎ রয়েছে। প্রথমত, নজরুলের বিভিন্ন প্রবন্ধ-সংকলনের অন্তর্গত রচনাসমূহ মূলত একাধিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম, যা দীর্ঘ সময়ের পরিশীলন ও যুক্তি-মননের পরিচর্যা ব্যতীতই লিখিত। দ্বিতীয়ত, এসব রচনার প্রেক্ষাপট ও প্রসঙ্গ সমকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় লিখিত। তৃতীয়ত, প্রবল আবেগোচ্ছ্বাস ও ভাবোন্মাদনাবশত প্রচারধর্মিতার উদ্দেশ্যে তিনি রচনার শিল্পমানকে অগ্রাহ্য করে কাব্যধর্মী ভাষায়, বজ্রকণ্ঠে অলংকার ও বিশেষণের বাহুল্য প্রয়োগের দ্বারা অত্যল্প সময়ে যে গদ্যরচনা (প্রবন্ধ) পাঠকের নিকট উপস্থাপন করেন, তা কোনোভাবেই কালজয়ী ও যুগোত্তীর্ণ প্রবন্ধসাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে না। চতুর্থত, এসব প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যই ছিল সাধারণ মানুষের নিকট বিশেষ বক্তব্য পরিবেশন ও তাৎক্ষণিকতার প্রয়োজন মেটানো। পঞ্চমত; তাঁর এ ধরনের রচনায় আশ্রিত ভাষাভঙ্গিতে যুক্তি, শৃঙ্খলা, সংযম ও অনুশীলনের সতর্কতা অনুপস্থিত। তাই এসব গদ্যরচনা অধিকাংশ সমালোচককেই নিরুৎসাহিত করেছে তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনসমূহের শিল্পমান ও গদ্যরীতির প্রাতিস্বিকতা অনুধাবনে, নির্দেশে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে নজরুল-বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা আড়াই শতাধিকের বেশি হলেও হাতে গোনা কয়েকটি প্রবন্ধ-সংকলন ও পত্রিকা, সাময়িকীতে নজরুলের প্রবন্ধ আলোচনার প্রতিপাদ্যরূপে বিবেচিত হয়েছে। এখানেও কথা থেকেই যায়। কারণ, যে সীমিত সংখ্যক গবেষণা, সমালোচনা গ্রন্থ, সংকলন-সাময়িকীতে নজরুলের উপর্যুক্ত সম্পাদকীয় কলামসমূহ সমালোচিত-বিশ্লেষিত হয়েছে, সেখানেও গবেষক-সমালোচকদের আলোচনার প্রতিপাদ্য হয়েছে উক্ত রচনাসমূহের ভাববস্তু। নজরুলের তিনটি প্রবন্ধ

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংকলনের (*যুগবাণী*-১৯২২, *দুর্দিনের যাত্রী*-১৯২৬, *রুদ্র-মঙ্গল*-১৯২৭) প্রকরণরীতি বিষয়ক একক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ এখনো রচিত হয়নি। সে-কারণেই গদ্যশিল্পী নজরুলের গদ্যসত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও পাঠকের নিকট অনাবিস্কৃতই থেকে গেছে। নজরুল-সাহিত্যের সচেতন পাঠক ও সমালোচক হিসেবে এ দায়ভার এককভাবে কারো নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আমাদের সকলের। কারণ, আমরাই নজরুলের প্রবন্ধ সম্পর্কে আরোপিত ধারণা লালনপূর্বক এর যথার্থ মূল্যায়নে অনীহা প্রকাশ করছি। প্রকৃতপক্ষে নজরুলকে ভালোবাসলে, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম-আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাইলে তাঁর সাহিত্যকর্মের সত্যনিষ্ঠ যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গমের বিকল্প থাকতে পারে না। নজরুলের গদ্যচর্চা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের পরিধি *যুগবাণী* সংকলনকে অবলম্বন করে আবর্তিত।

বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবের বাহন ছিল ছোটগল্প। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' শীর্ষক ছোটগল্পটি (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম। এছাড়া তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটিও হলো একটি গল্প সংকলন *ব্যথার দান* (ফাল্গুন ১৩২৮)। এরপর কবিতা, সংগীত ও অন্যান্য সাহিত্যমাধ্যমে তাঁর পরিভ্রমণ ঘটে। 'আমার সুন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজের সাহিত্যজীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন—

> আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তার পর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। ধূমকেতু, লাঙ্গল, যুগবাণীতে, তারপর এই নবযুগে তাঁর শক্তি সুন্দর প্রকাশ এসেছিল; আর তা এল রুদ্র-তেজে, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন হক সাহেবের দৈনিকপত্র নবযুগে কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই, কিন্তু পনের দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।[১]

এ পর্যায়ে আমরা নজরুলের প্রাবন্ধিকসত্তার স্বরূপ নির্দেশের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গবেষক-সমালোচকদের অভিমত উদ্ধারসহ বিশ্লেষণে অগ্রসর হব।

> গদ্যলেখক হয়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে প্রকাশ পাবে, সে তো অনিবার্য।
> অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ এবং প্রধান দোষ। যাকিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে; ভাবতে বুঝতে সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি।[২]

> গদ্য রচয়িতা হিসাবে নজরুল বাংলাসাহিত্যে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানের দাবিদার নন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে কবিকৃতিই প্রধান। তবে তাঁর গদ্যরচনা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। ...নজরুলের প্রবন্ধগুলি মননশীলতার অভাবহেতু অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ এবং উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে কণ্টকিত। তবে তাঁর ভাষার পৌরুষ ও অকৃত্রিম ভাবাবেগে অনেকস্থলেই চমকিত হতে হয়। অনেক প্রবন্ধ সংবাদপত্রের তাগাদা মেটানোর জন্য রচিত বলে সময়াভাবে অযত্নবিন্যস্ত। ...নজরুলের কোনো কোনো রচনা অবাঞ্ছিতমাত্রায় প্রচারমূলক। এ সব সত্ত্বেও নজরুলের কয়েকটি রচনা তাঁর ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনসমালোচনার জন্যে মূল্যবান। তাই এক বিশেষ ধরনের আবেগও পৌরুষসমন্বিত গদ্যপ্রণয়নে তাঁর স্থান উপেক্ষণীয় নয়।[৩]

নজরুল ইসলাম স্বকাল-বিদ্ধ প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রাবন্ধিক রচনা সাহিত্যের অন্যান্য প্রশাখার তুলনায় স্বল্পবর্ধিত এবং কৃশকায়, কিন্তু চেতনার রূপান্তরিত পরিমাণে তা প্রামাণিক। ...তাঁর প্রাবন্ধিক চেতনাপ্রবাহের প্রতিবাদ, প্রত্যাশা, আবেগ-ভাবাবেগ, ক্ষোভ-অস্থিরতা, বোধ-প্রজ্ঞা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং তার রূপান্তর ও আধ্যাত্মিক পরিণতি বহু সমালোচকের প্রত্যাশিত পূর্বশর্তকে তৃপ্ত করে না সত্য, তবে তা মর্মান্তিক হলেও, নিগূঢ়ভাবে কালাশ্রয়ী ও ইতিহাসের স্রোত শৃংখলিত।[৪]

নজরুলের মধ্যে যে জ্বলন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ অনুভব করি তা বিশুদ্ধ শিল্পনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা নয় আর এজন্যেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তাঁর সমস্ত রচনার সম্পূর্ণ মূল্য কষে পাওয়া যায় না। ...তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন—কুড়িতে যেমন ছিলেন চল্লিশেও তেমনি রয়েছেন। তাঁর আবাল্যের অশিক্ষিতপটুত্বই তাঁর জ্ঞান ও ধীশক্তির অভাবে সার্থক কবিতা লেখার সময় পদে পদে বাধা দিয়েছে। শিক্ষা ও সাধনার অভাবে তাঁর গ্রাম্য মন শহরের বুদ্ধি ঔজ্জ্বল্যের সংঘাত সহ্য করতে পারেনি। ...এজন্যে নজরুলের দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার ওপর লেখা অনেক কবিতা, প্রবন্ধপুস্তক ইত্যাদি জনপ্রিয়তার হাটে দামে বড্ড চড়া ছিল কিন্তু আজ সেসব বকেয়ার তালিকা বৃদ্ধি করেছে মাত্র। ...

নজরুল জাত গদ্যলেখক ছিলেন না, অধ্যবসায় তাঁকে দিয়ে কিছু গদ্য লিখিয়ে নিয়েছে। গদ্যলেখক নজরুলের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে তিনি প্রবন্ধ লিখতে বসে প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের দিকেই নজর দিয়েছেন বেশী। তাই সাম্প্রতিক প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে তাঁর রচনার মূল্য অনেক কমে গেছে সাহিত্য হিসেবে। বস্তুকে অতিক্রম করে যে আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতির স্পর্শে সাহিত্য জন্মায়, তা তিনি ধরতে পারেননি, কেন না উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ও ভাষার পৌরুষতাকে প্রধানভাবে ধরে 'নবযুগ', 'ধূমকেতু'তে সম্পাদকীয় রচনার খাতিরে সাংবাদিকতা করেছেন। ...সাহিত্যের যারা সূক্ষ্ম দিকের রসসন্ধানী পাঠক তাঁদের কাছে এ বইগুলির আবেদন অত্যন্ত কম, পুরোনো খবরের কাগজের মতো বাসি হয়ে গেছে, সমাজতত্ত্ব বা রাজনীতির দিক থেকে তার একটি বিশেষ মূল্য এখনও আছে বলে তাঁর বন্ধুরা দাবী করেন।[৫]

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে, নজরুলের ছিল সর্বতোমুখী প্রতিভা, কিন্তু ঘটনা তার উল্টো। অন্বেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী তো নন-ই, তিনি বহুমুখী প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একান্তই কবি। ...নজরুলের হাতে উপন্যাসের গদ্য ও প্রবন্ধের গদ্য হয়ে পড়েছে একই জাতের। ভাষার স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ও সদা সম্মুখবর্তিতা তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর গদ্য বক্র, স্ফূর্তিবাজ, চলার আনন্দে পথ ভুলে থাকে। এবং বেশ বিলম্বে যখন গন্তব্যস্থলের কথা মনে পড়ে তখন বড় তাড়াহুড়া করে এগিয়ে যায়।[৬]

গদ্যের মাধ্যমে আলোকপাতের চেয়ে কবি তাঁর পাঠককে অভিভূত করতে চেয়েছেন বেশী, তার আবেদন পাঠকের জ্ঞানের কাছে নয়, অনুভূতির প্রতি। অর্থের চেয়ে ইঙ্গিতের মহিমায় তাঁর গদ্য অধিকতর শক্তিশালী। তাঁর গদ্য আশ্চর্য এক চমক ও ঔজ্জ্বল্যের বিপুল রংবাহার। পাঠকের কাছে তাঁর গদ্যের আবেদন অপ্রতিরোধ্য। ...তাঁর গদ্য রচনাবলীও বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী ও মূল্যবান সম্পদ।[৭]

গদ্যেও প্রকাশিত হয়েছেন তিনি। সে গদ্য আবশ্যকীয়ভাবেই কবির গদ্য। ...গদ্যে তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী প্রদর্শিত পথেরই এক বিমুগ্ধ পথিক। ...কবি নজরুলের গদ্য রচনা তাঁর কবিতারই এক সম্প্রসারিত এলাকা, এক সম্পূরক প্রবাহ। এর ভাষা কবিতারই ভাষা।[৮]

> বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নজরুল অনুল্লিখিত। প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা তাঁর নামোল্লেখেরও প্রয়োজন বোধ করেননি। এমনকি যাঁরা তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাঁরাও তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করার বড় একটা গরজ বোধ করেননি। তাঁর প্রতিভার এদিকটির প্রতি এতখানি অবহেলা সত্যিই বিস্ময়াবহ বলে মনে হয়। ...নজরুল প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করতে হলে তাঁর প্রবন্ধও উপেক্ষণীয় নয়। ...একজন সৎ ও যুগন্ধর কবির মূল্যায়নের জন্য এই সকল প্রবন্ধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[৯]
>
> নজরুল গদ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। ...গদ্যের ভেতরেও সৃজনশীল মহিমা আছে—নজরুল গদ্যে তা দুর্লভ নয়। আমাদের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে নজরুল গদ্য আলোচনার বিষয়রূপে গুরুত্ব লাভ করেনি—আলোচনা যে একেবারে হয়নি তা নয়, তবে যা হয়েছে তাতে মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তরিকতা বিরল। ...নজরুল ইসলামের গদ্যের যে নিজস্বতা আছে, বিশিষ্টতা আছে, আপন চেহারা আছে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়নি। নজরুল গদ্যের শৈলীগত বিচার...আমাদের বিচারকদের কাছে প্রায় গুরুত্বহীন রয়ে গেছে। নজরুল সংক্রান্ত বড় বড় আলোচনা গ্রন্থে তাঁর গদ্য-শৈলী এবং গদ্যরচনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেই, এমন কি ঐ-সব গ্রন্থকারদের কেউ কেউ আজো নজরুল গদ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল নন।[১০]
>
> নজরুল গদ্যের সামগ্রিক আলোচনা বিষয়ক একক গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে নেই। 'কবি নজরুল'-এর ওপর সংকলন ও একক গ্রন্থের সংখ্যা উভয় বাংলায় দুশ'র কাছাকাছি। কিন্তু নজরুল গদ্যের একক-পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা গ্রন্থ পাওয়া যায় না। নজরুল জীবনীকার ও সমালোচকগণ একক গ্রন্থে কবি-নজরুলের কাব্যের আলোচনার পাশাপাশি গদ্যেরও আলোচনা করেছেন। কিন্তু কেউই নজরুল গদ্যের সামগ্রিক দিকের উপর একক কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। আমি সে অভাব পূরণ করবার চেষ্টা করেছি। কতখানি সার্থক হয়েছি সে বিচার আপনাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।[১১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ একটু সচেতনভাবে লক্ষ করলে নজরুলের গদ্যরীতিতে প্রতিফলিত মনোভঙ্গি ও সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি তাঁর প্রবন্ধের দোষ-গুণ সম্পর্কে সমালোচক-বিশ্লেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের সমালোচনা লক্ষণীয়। কিন্তু নেতিবাচক সমালোচনার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সমালোচকের বিবেচনাবোধ যথেষ্ট খণ্ডিত, সংকীর্ণ মানসিকতায় আক্রান্ত। তাঁরা নজরুলের মেধা-মননের কৃতিত্ব মূল্যায়নে যেমন দ্বিধান্বিত, তেমনিভাবে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর অবদান স্বীকারেও অসম্মত। কেননা তাঁরা নজরুলের গদ্যশিল্পিসত্তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর কবিসত্তাকে কোনোভাবেই বিস্মৃত হতে পারেননি; তাঁর কবিসত্তা ও গদ্যশিল্পিসত্তাকে তুল্যমূল্যে বিচার করতে গিয়ে নজরুলকে মেধা-মননহীন গড়পরতা সাধারণ গদ্যরচয়িতা হিসেবে অন্তিম সিদ্ধান্তে এসেছেন।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিবেচনা কখনোই একজন সৎ সমালোচকের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, তা হলো—সৃষ্টিশীল ব্যক্তিমাত্রই তার আবেগ, অনুভব, সংবেদনশীলতা, বোধ, প্রজ্ঞা, মেধা, মনন, খেয়াল ও মেজাজে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। তাই তার সৃষ্টিশীলতার বহিঃপ্রকাশ যে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে স্বকীয়রূপে অভিব্যক্ত হবে, সেটিই স্বাভাবিক। এ কারণে নজরুলকে গদ্যশিল্পী হিসেবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের মানদণ্ড অনুসরণ করা হলে তা যুক্তিসংগত হবে না। কেননা, প্রতিবেশ-সমাজ-সমকালের অভিঘাতে বাধ্য হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

পরিসমাপ্তির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অচিরেই তিনি সাংবাদিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা প্রাবন্ধিকদের মতো সুপরিকল্পনা অনুযায়ী দীর্ঘ সময়ের পরিসরে ব্যাপক অধ্যয়ন ও শ্রমনিষ্ঠ পঠনের দ্বারা নিজেকে গড়ে তুলে কলম ধরার সুযোগ তাঁর ছিল না। ব্যক্তিজীবনের ভাঙা-গড়া, চড়াই-উতরাইয়ের পাশাপাশি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমাজের অগ্নিপ্লাবী চেতনায় উদ্বোধিত হওয়ার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর সৃষ্টিশীল মানসিকতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। নজরুলের পূর্ববর্তী তিন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক — বঙ্কিমচন্দ্রের পরিমার্জিত রুচি, রবীন্দ্রনাথের শুচিতা ও শালীনতাবোধ, প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ মনোভঙ্গি ও অত্যুচ্চ শিল্পজ্ঞান বাংলা গদ্যসাহিত্যকে গড়পরতা বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনদৃষ্টির পরিসর থেকে বহুদূরে নিয়ে এসেছে। এর পরিণতিতে প্রবন্ধসাহিত্যও সুস্পষ্টভাবেই কৃত্রিমতার বন্ধনে শৃঙ্খলিত হয়ে গণজীবনবিযুক্ত হয়ে পড়েছে। ঠিক এর বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস, আবেগ, মননের বৃত্তকে উপেক্ষাপূর্বক নজরুল তাঁর ব্যক্তিক মানসভঙ্গি, সংবেদনশীল-সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে সচেতন সমাজচেতনার সংশ্লেষে যে শিল্পাভিজ্ঞানকে ক্রমশই 'নবযুগ'-এর সম্পাদকীয় কলামে ফুটিয়ে তুলেছেন, তারই প্রথম পরিচ্ছন্ন গ্রন্থরূপ হলো *যুগবাণী*। নজরুল সমকালে ও উত্তরপর্বে সাহিত্যিক-সমালোচকদের দ্বারা বিভিন্নভাবে মূল্যায়িত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ নিতান্তই প্রাসঙ্গিক। অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'র দ্বাদশ সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতা (১৯২২, ২৭ সেপ্টেম্বর) প্রকাশের পর পত্রিকাটি রাজরোষে পতিত হয়। এ ঘটনার একপর্যায়ে তিনি সরকারি নির্দেশে কারারুদ্ধ হন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি ও পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর অন্তরীণ অবস্থায় ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করার পাশাপাশি তাঁকে 'কবি' অভিধায় ভূষিত করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি তাঁর কবিতার পাঠক, ভক্ত ও অনুরাগীদের কবি নজরুল-সম্পর্কিত বিরূপ মানসিকতা প্রসঙ্গে বলেন—

> তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।[১২]

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 'কবি' সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়া কোনো সৃজনকুশলী ব্যক্তির বিচিত্র প্রজ্ঞাঘন সংবেদনারাশির পরিশীলিত বাণীবদ্ধ রূপকে উপলব্ধির জন্য পূর্ববর্তী ধারণা ও ভ্রান্ত মনোভঙ্গি পরিত্যাগপূর্বক তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতি একনিষ্ঠ মনোনিবেশ, আন্তরিক পঠন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আজহারউদ্দীন খান নজরুলের লেখনী সম্পর্কে যে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন (পূর্বে উল্লেখিত, উদ্ধৃতির উৎস তথ্যনির্দেশ অংশে দ্রষ্টব্য), তার বিপরীতে অন্য দুজন সমালোচকের অভিমত—

> "গদ্য লেখক হয়ে তিনি জন্মাননি; গদ্যও তিনি লিখেছেন এবং গদ্যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা দুঃসহ হয়ে প্রকাশ পাবে সে তো অনিবার্য।"
> এই মন্তব্য নিতান্ত দুঃখজনক এবং ভ্রমাত্মক। কেননা তিনি শুধু একজন গদ্যলেখক নন, গদ্যশিল্পীও। তাঁর গদ্যরীতি গতিবেগে, সঙ্গীতময়তায়, চিত্রময়তায়, প্রাণপ্রাচুর্যে, আন্তরিকতায় ও পৌরুষে সমৃদ্ধ।[১৩]

> বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন "অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ এবং প্রধান দোষ। যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে। ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেন নি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি"। কিন্তু এ ধরনের সমালোচনার সমস্যা হল এই যে, যে কবির যে চরিত্র তাকে ঐভাবে না দেখে ভিন্ন একটি মান আরোপের চেষ্টা করা হয় তার কাব্যবিচারে, এবং কবির সৃষ্টি-প্রক্রিয়া একটি সহজ ও আরোপিত মাপকাঠিতে ফেলে অত্যন্ত সরলভাবে বিশ্লেষণ করার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় ঐ ক্ষেত্রে![১৪]

যে কোনো মহৎ-সৃষ্টিশীল শিল্পীর প্রাতিস্বিকতা পরিস্ফুট হয় তাঁর রচনাভঙ্গির বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যের মানদণ্ডে। একে আমরা সাহিত্যিক পরিভাষায় শৈলী বা রীতি হিসেবে বিবেচনা করি। প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে একেই গদ্যরীতি বা গদ্যশৈলী বলা হয়। তিনিই সফল শিল্পী, যিনি সৃষ্টিশীলতাকে নিজস্ব বিবেচনা ও শিল্পাভিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ায় জারিত করে অনায়াসেই সমকালীন জীবন ও প্রতিবেশের প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তোলেন। এক্ষেত্রে অন্যের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে নিজস্বতার বহিঃপ্রকাশেই তাঁর কৃতিত্ব স্বতঃসিদ্ধি অর্জন করে। *যুগবাণী* সংকলনের গদ্যরীতি ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত ভাবনার প্রতিফলন অবশ্যই বিচারসাপেক্ষ। নজরুলের পূর্বসূরি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের আদ্যন্ত সুশৃঙ্খলা ও পরিমিত বিন্যাসরীতি , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের ভাবনিষ্ঠ মনন ও শিল্পানুভবের অদ্বৈত সম্মিলন, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের যুক্তি, তর্ক, দৃষ্টান্ত, কৌতুকের পাশাপাশি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্যুতিময় প্রতিফলন যদিও নজরুলের প্রবন্ধে আমরা লক্ষ করি না; তবুও তাঁর প্রবন্ধ অনন্য লেখনীতে প্রতিবিম্বিত বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি, বক্তব্যের ক্ষুরধার তীব্রতা, বজ্রকণ্ঠী উচ্চারণের নিপুণতা ও হৃদয়াবেগের পরিমার্জিত শিল্পবিন্যাসে। তাঁর লেখনীর চমৎকারিত্ব, বিষয়বস্তু নির্বাচনের সচেতনতা, সংবাদকে যথোপযুক্ত শিরোনামসহ বিশেষ কৌশলে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন, বক্তব্যকে বাঙালি পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত কথোপকথনের বিশিষ্ট ভঙ্গির সঙ্গে প্রবাদ-প্রবচন ও লোকজ শব্দরাশির যুগ্ম সন্নিবেশ, আরবি-ফারসি শব্দের পাশাপাশি তৎসম শব্দের পরিকল্পিত প্রয়োগ বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। এছাড়াও হিন্দুপুরাণ ও ইসলামী ঐতিহ্যের সহাবস্থান, অলংকারশোভিত বাক্য ও ধ্বনিময় শব্দরাজি, গদ্যছন্দের সচেতন বিন্যাসের পাশাপাশি উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে কথকতার ভঙ্গিতে গতিময় ভাষার আশ্রয়ে বক্তব্যকে অতি দ্রুত পাঠকের নিকট আন্তরিকভাবে উপস্থাপনের অনায়াস দক্ষতায় তাঁর প্রবন্ধসমূহ সেকালে সমধিক পাঠকানুকূল্য ও খ্যাতি অর্জন করে। এককথায়, তাঁর গদ্যরীতি তাঁরই নিজস্ব গদ্যরীতি। নজরুল-রচিত প্রবন্ধসমূহে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে অবশ্যই এর যথাযথ আবেদন হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। *যুগবাণী*-র প্রবন্ধসমূহের বিন্যাসরীতি সম্পর্কে নজরুলের সুহৃদ কমরেড মুজফফর আহমদের মন্তব্য গুরুত্ববহ—

> এ কথা মানতেই হবে যে নজরুলের জোরালো লেখার গুণেই "নবযুগ" জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জোরালো লেখার বললে সব কিছু বলা হলো না, নজরুলের লেখা হেডিংগুলো হতো অতুলনীয়। রয়াল সাইজের কাগজ — কতটুকুই বা স্থান। তাই নজরুল সফলতার সহিত বড় বড় খবরগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত খবরে পরিণত করত। আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই কী করে নজরুল আয়ত্ত করেছিল এই ক্ষমতা! তার আগে তো সে কোনদিন দৈনিক কাগজের অফিসে প্রবেশও করেনি।[১৫]

যুগবাণী-র গদ্যরীতি ও প্রকরণ

বাক্যবিন্যাসরীতি

১. প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের দুর্বার মনোভঙ্গিকে প্রবল আবেগোন্মাদনা ও ভাবোচ্ছ্বাসসিক্ত ভাষায় বাণীরূপ প্রদানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক কথোপকথনের ভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে সংলাপের আশ্রয়ে, যা কথাসাহিত্যের বিশেষ প্রবণতা —

> রুশিয়া বলিল, 'মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। ...'আল্লাহু আকবর' বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। ...আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে'। ('নবযুগ', পৃ. ৩৭২)[১৬]

২. কখনো কখনো বাক্যরাশিতে কোমলতা, বক্তব্যের আন্তরিকতা ও কবিতার মতো সুরমূর্ছনার বিন্যাস লক্ষণীয় —

> তোমার পরিমলের উদাস সুরভি নিয়ে এসে আমেজ দাও রাজার যত গুল-ভরা বাগিচায়। অনাদৃতা তুমি, তাই বলে তোমার ওই এক নিশ্বাসের সুরভিটুকু নিয়ে গর্বিতার মতো এসো না। এসো তুমি আধ-মুকুলিত-যৌবনা নববধূর মতো ধীর-মন্থর চরণে — পায়ের মুখর পায়জোর সামলে! লাজ-জড়িমা-জড়িত তোমার বুক ভরে থাকে যেন পূত শালীনতা সংযম আর প্রশান্ত প্রীতির স্নিগ্ধ শান্তি! ('জাগরণী', পৃ. ৪২৭)

৩. নজরুলের প্রবন্ধের ভাষা যুক্তিশীলতার পরিধিকে অতিক্রম করে যায় বলে যে অভিযোগ প্রায়শই উত্থাপিত হয়, তা ভ্রান্ত প্রমাণ করতে নিচের গদ্যাংশই যথেষ্ট; যেখানে রয়েছে যুক্তির শৃঙ্খলায় আবেগ ও মননের সম্মিলিত রূপ —

> আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। ...প্রাণ-শক্তি আর কর্ম-শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।
> ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', পৃ. ৪২৬)

৪. স্বীয় যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক কখনো কখনো সম্ভাব্য মতামত উপস্থাপনার পর নিজেই তা খণ্ডন করেন —

> আমাদের এই তর্কের সবচেয়ে সাধারণ সূত্র হইতেছে, দাসত্ব-গোলামি ছাড়িয়া দিলে খাইব কি করিয়া? কি নিচ প্রশ্ন? যেন আমাদের শুধু কুকুর-বিড়ালের মতো উদর-পূর্তির জন্যই জন্ম! ...আমাদের এ মোহ-ভার ভাঙিবে কে? এ-শৃঙ্খল মোচন করিবে কে? আছে, উত্তর আছে এবং তাহা 'আমরাই'। ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৬)

৫. যুক্তি-তর্কের প্রয়োজনে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে গিয়ে প্রাবন্ধিকের ভাষা কখনো কখনো তীব্র শ্লেষাত্মক, গতিময়, ধারালো ও ক্ষিপ্র —

> তুমি কি চাও? কুকুর-বিড়ালের মতো ঘৃণ্য-মরা মরিতে, না মানুষের মতো মরিয়া অমর হইতে? তুমি কি চাও? শৃঙ্খল না স্বাধীনতা? তুমি কি চাও? — তোমাকে লোকে মানুষের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করুক, না পা-চাটা কুকুরের মতো মুখে লাথি মারুক? তুমি কি চাও? —

উষ্ণীষ–মস্তকে উন্নত-শীর্ষ হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষের মতো গৌরব দৃষ্টিতে অসঙ্কোচে তাকাইতে, না নাঙ্গা শিরে প্রভুর শ্রী পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কুব্জপৃষ্ঠে গোলামের মতো অবনত হইয়া হুজুরির মতলবে শরমে চক্ষু নত করিয়া থাকিতে? যদি এই শেষের দিকটাই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তুমি জাহান্নামে যাও! তোমার সারমেয় গোষ্ঠী লইয়া খাও-দাও আর পা চাটো।

('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৭)

নজরুলের প্রবন্ধের যুক্তিশীলতা সম্পর্কে সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত —

নজরুলকে মনে হবে ভাবালু। কিন্তু তিনিও আসলে যুক্তিনির্ভর। তাঁর বক্তব্য আবোলতাবোল নয়, যদিও সে রকম ধারণা হতে পারে। বক্তব্যকে তিনি একটি পরিণতিতে নিয়ে যান।[১৭]

৬. এ গ্রন্থের গদ্যরীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে সংহত, জড়তামুক্ত ভাষাভঙ্গি —

এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউদাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, ...গণতন্ত্র ও ডিমোক্রেসির জাগরণও এ দেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। ...এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।

('ধর্মঘট', পৃ. ৩৮৩)

৭. কখনো কখনো সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি নির্দেশনার দ্বারা উক্ত চরিত্রের মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট করার প্রবণতাও ভাষায় পরিলক্ষিত হয় —

একবার এক সাহেবের গুলির চোটে আমাদের স্বগোত্র এক কালা আদমি মারা যায়, তাহাতে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'কৌন মারা গিয়া?' একজন আসিয়া বলিল, 'এক দেহাতি আদমি হুজুর!' সাহেব দিব্যি পা ফাঁক করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওঃ হাম সম্‌ঝা থা. কোই আডমি!' ('কালা আদমিকে গুলি মারা', পৃ. ৪১০)

৮. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সমান্তরালে হাস্য-পরিহাসের প্রবণতাও তাঁর গদ্যরীতির বিশেষ দিক —

খুব সোজা করিয়া বলিতে গেলে নন কো-অপারেশন হইতেছে বিছুটি বা আলকুশি, এবং আমলাতন্ত্র হইতেছে ছাগল। ছাগলের গায়ে বিছুটি লাগিলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, এই আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা-বিছুটির জ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ('মুখবন্ধ', পৃ. ৩৭৮)

৯. শাসক-শাসিতের আন্তঃসম্পর্কের বৈষম্য নির্দেশের ক্ষেত্রে কখনো কখনো জবাবদিহিতার ভঙ্গিতে বক্তব্য উপস্থাপনের পাশাপাশি কৈফিয়ত তলবের প্রবণতা—

আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে তোমাদের গুলি পৌঁছিতে পারে না। ...দাও, উত্তর দাও! বলো তোমার কি বলিবার আছে! ('মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?', পৃ. ৩৮৭)

১০. একাধিক খণ্ডবাক্যের আশ্রয়ে সম্পূর্ণ বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার প্রাধান্য নির্দেশ —

যাহাকে হত্যা করিলে, তাহাকে হত্যা করিয়াও ছাড়ো নাই, তাহার লাশ তিন দিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া পচাইয়া গলাইয়া ছাড়িয়াছ।

('মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?', পৃ. ৩৮৭)

১১. কখনো কখনো যৌগিক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান খণ্ড বাক্যাংশের মধ্যে সংযোজক অব্যয় ব্যবহারের পর পুনরায় আরেকটি সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করে বাক্যকে পূর্ণতা প্রদান —

> তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? ('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', পৃ. ৩৯৫)

১২. অস্তিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভাবকে একই বাক্যে তাৎপর্যপূর্ণরূপে উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রবাদ-প্রবচন সহযোগে বাক্যের শুরুতেই সেই ধরনের শব্দাংশের ব্যবহার লক্ষণীয়—

> হাঁ, এখন কথা হইতেছে — বাণিজ্য দ্বারা আমরা স্বজাতির নাম করিব, স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিব, না — অন্য বড় জাতির নাম দিয়া নিজের নাম ভাঁড়াইয়া বড় হইয়া বড় জাতিরই তেলা মাথায় তেল ঢালিব? ('বাঙালির ব্যবসাদারি', পৃ. ৪০৫)

১৩. নঞর্থক প্রশ্নবাচক বাক্য গঠন —

> লোকে তাহার এই মিথ্যা মুখোশে বরং আরো টিটকারি দেয় না কি?
> ('বাঙালির ব্যবসাদারি', পৃ. ৪০৬)

১৪. যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত খণ্ড বাক্যাংশসমূহে পুনরায় একাধিক জটিল বাক্য গঠনের প্রবণতা —

> যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা এখন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু যাহাদের সাহস আছে, আত্মসম্মান আছে, জাতিকে যিনি বড় করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার উচিৎ এখ্‌খুনই এ মিথ্যা মুখোশটাকে দূর করিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া নিজের বিশ্বাসে নিজের কৃতিত্ব কর্মকুশলতা ও পৌরুষের পুঁজি লইয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে দাঁড়ানো। ('বাঙালির ব্যবসাদারি', পৃ. ৪০৭)

১৫. একটি বাক্যের অভ্যন্তরেই উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহারপূর্বক আরেকটি বাক্য প্রবিষ্ট করার প্রবণতা —

> আজ আমরা তাহাকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, তাহারই পায়ের ধুলা মাথায় লইব, — তিনি মুচি, ডোম, হাড়ি, যেই হউন — যিনি মহাবীর কর্ণের মতো উচ্চশিরে সর্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন, 'আমি সূতপুত্রই হই, আর যেই হই, আমার পুরুষকারই আমার গৌরব, আমার মনুষ্যত্বই আমার ভূষণ! ('বাঙালির ব্যবসাদারি', পৃ. ৪০৭)

১৬. ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নবাচক বাক্য গঠনের পর এর উত্তর নির্দেশের প্রবণতা —

> ...আমরা কেন এমন দিন-দিন মনুষ্যত্ব বর্জিত হইয়া পড়িতেছি? কেন ভণ্ডামি, অসত্য, ভীরুতা আমাদের পেশা হইয়া পড়িয়াছে? কেন আমরা কাপুরুষের মতো এমন দাঁড়াইয়া মার খাই? ইহার মূলে ঐ এক কথা, আমরা অধীন — আমরা চাকরিজীবী।
> ('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?',পৃ. ৪০৮)

১৭. বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যুক্তি-তর্কের সমান্তরালে প্রাবন্ধিকের স্বীয় মনোভঙ্গিও গদ্যরূপ অর্জনে সক্ষম —

লর্ড রিডিং প্রত্যুত্তরে বলেন, 'আমি সার আলি ইমামের সব কথা মানিয়া লইতেছি, তবে তিনি আমার যে স্বার্থত্যাগের কথা বলিয়াছেন,তাহা সত্য নয়, (অ্যা, — যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!) ('লাট-প্রেমিক আলি ইমাম', পৃ. ৪১৫)

১৮. একাধিক সম্বোধন পদকে একই সরল বাক্যে ব্যবহার —

এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। ('নবযুগ', পৃ. ৩৭৩)

১৯. কথ্য শব্দের প্রাধান্যসূচক বাক্য গঠন —

চাষি সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না; হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা তেনা বা নেঙট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা-জীবনেও ঘটিয়া উঠে না...অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন। ('ধর্মঘট', পৃ. ৩৮২)

২০. তৎসম বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার —

ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল, 'আবিরাবির্ম এধি'।
('নবযুগ' পৃ. ৩৭২)

২১. হিন্দি বাক্যাংশের প্রয়োগ —

হায় মেরি ফর্জন্দ (হায় আমার সন্তান)–আহ্ মেরি বেটা!
('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)

২২. সংখ্যাবাচক শব্দের প্রাধান্যসূচক বাক্যাংশ —

কত শত বর্ষের কত সহস্র শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধন ... ('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)

২৩. ধ্বনিময়তা সৃষ্টির জন্য প্রায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার —

ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে করো, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও!
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৮)

২৪. অন্ত্যমিলবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার—

হস্তে তাহাদের মুক্তির নিশান — মুখে তাহাদের মুক্তির বিষাণ,
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৬)

২৫. বিপরীতার্থক শব্দযোগে বাক্য গঠন —

যাহারা পশুশক্তির ব্যবহার করিয়া বাহিরে এত দুর্বার-দুর্জয়, অন্তরে তাহারা বিবেকের দংশনে তেমনি ক্ষত-বিক্ষত, অতি দীন।
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৫)

২৬. একই বাক্যে ক্রিয়ার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সমন্বিত ব্যবহার —

কত উত্থান, কত পতন এই ভারত দেখিয়াছে, দেখিতেছে এবং দেখিবে।
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৫)

পদবিন্যাসকৌশল

ক্রিয়াপদ

১. একই ক্রিয়ার ধারাবাহিক ব্যবহার —

সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে, আয়র্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান, — ('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)

২. ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার —

আমাদের এই নির্লজ্জ কাপুরুষতাকে ভীম পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে এই জেনারেল ডায়ার। ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', পৃ. ৩৮০)

৩. বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য বিশেষ প্রত্যয় (ই) ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রবণতা —

সিংহের চামড়ার মধ্য হইতে লুকানো গর্দভ মূর্তি বাহির হইয়া পড়িবেই।
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৫)

৪. অসংখ্য অসমাপিকা ক্রিয়াকে শ্লেষের অনুষঙ্গে ব্যবহারপূর্বক বাক্যের পূর্ণতা নির্দেশের প্রবণতা —

যে নিষ্ঠীবন মাথায় করিয়া প্রভুর দেওয়া যে চাপ্‌রাশ পরিয়া, যে ছিন্ন জুতার মালা গলায় দুলাইয়া আমরা আহমকের মতো দুনিয়ায় স্বাধীন জাতিদের সামনে দাঁড়াইয়া, গোলামির ঝুঁটা গৌরব দেখাইতে গিয়া শুধু হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম, ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', পৃ. ৩৮০)

৫. বাক্যে বিশেষ্যকে (কর্তা) উহ্য রেখে ক্রিয়ার প্রাধান্য নির্দেশ —

কাঁদিয়াছি — গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়াছি। ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', পৃ. ৩৮১)

৬. ক্রিয়াকে সর্বদাই বাক্যের শেষাংশে ব্যবহারের পরিবর্তে কখনো কখনো বাক্যের মধ্যে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত —

নিশ্চয়ই তুলিব তোমার স্মৃতিস্তম্ভ, মহৎ প্রতিহিংসারূপে নয়, প্রতিদান স্বরূপে।
('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' পৃ. ৩৮১)

৭. একই বাক্যে পুনঃপুন নঞর্থক ক্রিয়ার ব্যবহার —

অন্ধের মত কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না।
('ভাব ও কাজ', পৃ. ৪২০)

৮. সমধাতুজ কর্মের প্রয়োগ —

সার আলি ইমাম এখন লাট হইবার আশায় কত রকম ঢলানই ঢলাইবেন।
('লাট-প্রেমিক আলি ইমাম', পৃ. ৪১৬)

বিশেষণ

১. বিশেষণের বিশেষণ প্রয়োগ —

এই আজাদির সাড়া না পাইলে আমাদের জীবনে আজ এমন তরুণের উচ্ছৃঙ্খলতা, সবুজের স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিত না। ('সত্য-শিক্ষা', পৃ. ৪২১)

২. বিশেষণে অনুপ্রাসজাত ধ্বনিময়তা সৃষ্টি —

বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাহাদের মুঞ্জরিত জীবন-পুষ্প শুকিয়া যাইবে না,
('সত্য-শিক্ষা', পৃ. ৪২১-৪২২)

৩. একই বাক্যে একাধিক বিশেষণের সমন্বিত প্রয়োগ —

শিয়রে তাহাদের মুক্তির তৃপ্তি ভরা মহা গৌরবময় মৃত্যু।
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৬)

সর্বনাম

১. একই বাক্যে একাধিক সর্বনামের পাশাপাশি ব্যবহার —

তোমার-আমার অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে;
('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', পৃ. ৩৮১)

২. সর্বনামের প্রাধান্যসূচক বাক্যাংশ —

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।
('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', পৃ. ৩৯৭)

৩. একাধিক প্রশ্নবাচক সর্বনামের পাশাপাশি ব্যবহার —

অন্যে কে কি করিতেছে আগে দেখাও,
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৬)

অব্যয়

একাধিক অব্যয়ের পাশাপাশি ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্য গঠনের প্রবণতা —

আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটি লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনো জলে নামিতেছেন,
('মুখবন্ধ', পৃ. ৩৯৮)

বিশেষ্য

একই বাক্যে একাধিক জাতিবাচক বিশেষ্যের প্রাধান্য —

হিন্দু-মুসলমান মাড়োয়ারি বাঙালি হিন্দুস্থানি কোনো ভেদাভেদ ছিল না,
('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)

শব্দব্যবহার

'যুগবাণী' সংকলনে নজরুল বিচিত্রমাত্রিক শব্দকে ভাব প্রকাশের যথার্থ অনুষঙ্গে বিন্যস্ত করেছেন। সেকারণেই সেখানে কথ্যক্রিয়া ও দেশজ শব্দের পাশাপাশি স্থান পায় আরবি, ফারসি, তৎসম ও ইংরেজি শব্দ; আবার তৎসম সমাসবদ্ধ পদের সঙ্গে বাংলা সমাসবদ্ধ পদের অবস্থানও বিভিন্ন প্রবন্ধে লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, শব্দরাশির বিচিত্র বিন্যাসের অন্তরালে নজরুলের শিল্পিমানসে বহুজাতিক বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারের অনুরাগী মানসিকতার পরিচয়টি সুস্পষ্ট হয়।

আঞ্চলিক শব্দ

পরশ, বাঁশি, মুণ্ড, কাঙাল, বুলি, খামখেয়ালি, মেথর, ভান, চাষী, কয়লা, কুলি, খোঁচা, বাছা, পাকা, কুড়ি, টিকি, ব্যামো, ঘা, চড়ক, টুটি, তিল, জোঁক, মুদি, পাড়াগাঁ, ডোম, ঝুটা, উদর প্রভৃতি।

তৎসম শব্দ

শৃঙ্খল, মন্ত্র, অগ্নি, নমস্কার, সাগ্নিক, কৃষ্ণ, বহ্নি, মানব, বর্ষ, পৃষ্ঠ, অন্ধ, যজ্ঞ, প্রাণ, আহুতি, হস্ত, মূর্তি, সত্য, আত্মা, রণ, রন্ধন, তর্পণ, স্মৃতি, সিক্ত, চক্ষু, অঙ্গ, বক্ষ, শোণিত, সুত, ক্রোড়, পুত্র, বিশ্ব, বলি, মৃত্যু, সারমেয়, দক্ষিণ, অশ্রু, পুষ্প, কল্যাণ, উলঙ্গ, ক্রন্দন, অক্ষয়, বেত্র, মঙ্গল, চন্দন, দংশন প্রভৃতি।

তৎসম সমাসবদ্ধ পদ

শ্মশানবেলা, মানবাত্মা, হোম-শিখা, মহামাতা, প্রাণ-শিখা, বন্ধন-জর্জরিত, রণ-কোলাহল, রণক্লান্ত, হর্ষ-বাণী, কৃষ্ণশিখ, জগদ্ধাত্রী, বহ্নি-ঘাত, অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত, রক্ত-প্রভাত, অণু-পরমাণু, মন্ত্র-বাণী, ক্ষত-বিক্ষত, কর্তব্য-জ্ঞান, অগ্নি-মন্ত্র, বিশ্ব-মানব প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দ

ক্রিশ্চিয়ান, ডিমোক্রাসি, বুরোক্রাট, আর্ট, টাউনহল, স্টেথিস্কোপ, ক্রিস্টো, মন্টোক্রিস্টো, পল, লিমিটেড, কোম্পানি, গবর্নমেন্ট, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি, কমিশনার, নেটিভ, গবর্নর, লর্ড, লেডি প্রভৃতি।

আরবি শব্দ

আল্লাহু আকবর, আরশ, সিজদা, খুন, দারাজহস্ত, অরমান, মাতম, মুহাজিরিন, শহীদ, মুজাদ্দিদ, বেদাৎ, সালাম, আজাদি, মোনাফেকি প্রভৃতি।

ফারসি শব্দ

বাতিল, গোলা, গুলি, বল্লম, তলোয়ার , ফকির, বাদশা, সরকার, গোলামি, সওদা, মজুরি, ইস্তাহার প্রভৃতি।

অপ্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে উত্তিষ্ঠিত, খোমার, মুদ্দই, দাদ প্রভৃতির ব্যবহার এ সংকলনের অন্তর্গত প্রবন্ধসমুহে লক্ষণীয়।

দ্বিরুক্ত পদ

ক. পদের দ্বিরুক্তি

সে বাঁশির সুরে সুরে নিখিল মানবের অণু-পরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে।
('নবযুগ', পৃ.৩৭১)

খ. ভিন্ন শব্দযোগে গঠিত দ্বিরুক্তি

তাহার বুক অত্যাচারীর আততায়ীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন। ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', পৃ. ৩৭৯)

গ. বিপরীত শব্দযোগে গঠিত দ্বিরুক্তি

তখন তাহার আর মান-অপমান জ্ঞান থাকে না । ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', পৃ. ৩৭৯)

ঘ. পাশাপাশি একাধিক দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহার

মহকুমায়-মহকুমায়, জেলায়-জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে রকম সৃষ্টিছাড়া হুকুম জারি করিতেছেন,
('শ্যাম রাখি না কুল রাখি', পৃ. ৪১২)

অলংকারশোভিত বাক্য

অনুপ্রাস

ঐ শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বাণী।

উপমা

ক. সাধারণ উপমা

পুত্রহীনা জননীর মতো সারা আকাশ জুড়িয়া কাহার আকুল ধারা ব্যাকুলবেগে ঝরিতেছিল।
('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৫)

খ. প্রবচনকেন্দ্রিক উপমা

চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড়ভরতের মতো বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিকে টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। ('বাংলা সাহিত্যে মুসলমান', পৃ. ৩৮৯)

গ. শ্লেষাত্মক উপমা

সোডা ওয়াটারের মতো আমাদের শক্তি, আমাদের সাধনা, আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমিষে উঠিয়াই থামিয়া যায়, শোলার আগুনের মতো জ্বলিয়াই নিভিয়া ছাই হইয়া যায়।

('আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?', পৃ. ৪০৯)

ঘ. অনুপ্রাস ও উপমার যুগ্ম প্রয়োগ

ভারতের অবস্থা এখন জটপাকানো জটার মতোই জটিলতাপূর্ণ।

('লাট-প্রেমিক আলি ইমাম', পৃ. ৪১৬)

প্রতীক

ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ। ('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)

সমাসোক্তি

হিন্দুস্থান কাঁপিয়া উঠিল — কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)

চিত্রকল্প

স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমানলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে, ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৬)

দৃষ্টান্ত

শক্তির অপব্যবহারের জন্য রোম-সাম্রাজ্য গেল, জার্মানির মতো মহাশক্তিরও পরাজয় হইল।

('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৫)

অতিশয়োক্তি

সেদিন আমাদের সে কান্না দেখিয়া মহাশূন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)

সন্দেহ

মনে হইতেছিল বুঝি সারা বিশ্বের বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে।

('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)

বিরোধাভাস

অনেকে মুখের উপরেই দোকানদারকে প্রবঞ্চক ভণ্ড বলিয়া মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন।

('বাঙালির ব্যবসাদারি', পৃ. ৪০৫)

যমক

সরকারী বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয় হয়। ('জাতীয় শিক্ষা', পৃ. ৪২৩)

গদ্যছন্দ ব্যবহার

নজরুল যুগপৎ কবি এবং গদ্যশিল্পী। তাঁর গদ্যে বারবার কবিতার গুণাবলি প্রযুক্ত হয়েছে। তাই সেখানে সাক্ষাৎ মেলে ভাবের প্রবহমানতার সঙ্গে ভাষার অন্তঃমিলের, পর্ববিন্যাসের প্রয়োজনে পদসমূহের একের সঙ্গে অন্যের ধ্বনিগত ও উচ্চারণগত সাদৃশ্যের। আমরা জানি, গদ্য ছন্দের নীতি বা সূত্রসমূহ পদ্য ছন্দের অনুরূপ। চরণের পর্বগত বহুত্ব, পর্বের সংগতি-সংহতি গদ্যছন্দেরও মূলসূত্র। তবে গদ্যছন্দে ধ্বনিসাদৃশ্যের চেয়ে অর্থের প্রাধান্যই লক্ষণীয়। নজরুল গদ্যছন্দকে এ সংকলনে সরাসরি ব্যবহার না করলেও কবিসত্তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্মের গুণেই তাঁর গদ্যে ব্যবহৃত বাক্যরাশির অন্তর্গত পদসমূহে রয়েছে ধ্বনিসামঞ্জস্য, সুর ও ছন্দের ঝংকার, সর্বোপরি অপূর্ব কাব্যিক ব্যঞ্জনা।

> বকুল? জা-গো/জাগো বকুল,/এই পল্লী মাঠের পথের পাশে/মেঠোগানের সহজ সুরে/জাগো। /জাগো তারই রেশের ছোঁয়ায়। //জাগো বেদন নিয়ে,/পল্লী শিশুর মুক্ত-বিহার-প্রাণ নিয়ে,/পল্লী তরুণের তাজা খুনের /তীব্র কাঁপুনি নিয়ে। //জাগো, — /জাগো বকুল, জাগো/
>
> ('জাগরণী', পৃ. ৪২৭)

তাই সমালোচকের অভিমত নজরুলের *যুগবাণী*-র ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক —

> গদ্য শুধু ভাব প্রকাশের বাহন নয়, আট পৌরে কাজের ভাষা মাত্র নয়। তার মধ্যেও শিল্প-শ্রী আছে যা কবিতার মত রসোদ্রেকে সমর্থ। সেই ধরনের গদ্য যিনি রচনা করতে পারেন তিনি শুধু গদ্য লেখক নন তখন তাকে যথার্থ গদ্য শিল্পী বলতে হবে।[১৮]

পরিচর্যারীতি

যুগবাণী সংকলনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধে কথাসাহিত্যের — বিশেষত উপন্যাস ও ছোটগল্পে ব্যবহৃত পরিচর্যারীতি অনুসৃত হয়েছে। অতীত প্রক্ষেপণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য ' ও 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধদ্বয়ে —

> ক. আজ মনে পড়ে সেই দিন আর সেই ক্ষণ — বিকাল আড়াইটা যখন কলিকাতার সারা বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ টাউনহলের খিলাফৎ আন্দোলন সভায় তাহাদের বুকভরা বেদনা লইয়া সম্রাটের সম্রাট বিশ্বপিতার দরবারে তাহাদের আর্তপ্রার্থনা নিবেদন করিতেছিল আর পুত্রহীনা জননীর মতো সারা আকাশ জুড়িয়া কাহার আকুল ধারা ব্যাকুলবেগে ঝরিতেছিল!
>
> ('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)
>
> খ. আমরা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লার হত্যা-বীভৎসতা। আজো মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিশের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁচাগাড়ি নামক স্থানে মুহাজিরিনদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়।
>
> ('মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?', পৃ. ৩৮৬)

কোনো কোনো প্রবন্ধে ভবিষ্যৎ-প্রক্ষেপণের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। 'নবযুগ' প্রবন্ধে পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খলিত, অবরুদ্ধ অবস্থার বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রাবন্ধিকের আশাবাদ —

> দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত, মহা মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসঙ্কোচ-দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ ঝাজরাপারা বক্ষ, সুত-শোণিত লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিও না। ...সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ('নবযুগ', পৃ. ৩৭৩)

ঘটনার বিবরণধর্মিতাও তাঁর প্রবন্ধে লক্ষণীয় —

> সমস্ত বড়বাজার ছাপাইয়া হ্যারিসন রোডের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রোরুদ্যমান লক্ষ লক্ষ লোক — মাড়োয়ারি, বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, কন্যা — শুধু বুক চাপড়াইতেছে, "হায় তিলকজি! আহ তিলকজি!...মাল্য-চন্দন বিভূষিত বিগত তিলকের জীবন্ত প্রতিমূর্তি! তাহারই কাঁধে করিয়া অযুত লোক চলিয়াছে জাহ্নবীর জলে বিসর্জন দিতে।
> ('মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?', পৃ. ৩৮৫)

বিরামচিহ্ন ব্যবহার

ক. কমার প্রাধান্যসূচক বাক্য —

> সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে, আয়র্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান, ('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)

খ. একই বাক্যে উদ্ধরণ চিহ্নসহ একাধিক স্বতন্ত্র বিরামচিহ্নের প্রয়োগ —

> আকাশ-বাতাস মন্থন করিয়া গভীর আর্তনাদ উঠিল, — 'তিলক আর নাই!'
> ('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)

অসংখ্য প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে পাঠকের চিন্তারাশিকে উজ্জীবিত করার প্রবণতা নজরুলের গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পুরাণ প্রসঙ্গ

নজরুল-সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় পুরাণের আধিপত্য সহসাই লক্ষণীয়। এ সংকলনেও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বোধিত প্রাবন্ধিক বহুজাতিক সংস্কৃতির পারম্পর্যে গড়ে ওঠা বিচিত্র পুরাণকে বক্তব্যে অভিনবত্ব আনয়নের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত করেছেন —

> ক. আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। ('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)
> খ. ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ। ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ-শঙ্খ! ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস ঘন রোল! ('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)
> গ. এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া জাগিলেন। ('নবযুগ', পৃ. ৩৭২)
> ঘ. সহসা লক্ষ কণ্ঠের ছিন্ন-ক্রন্দন কারবালা-মাতমের (কারবালার শোকোচ্ছ্বাস) মতো মোচড় খাইয়া উঠিল, ('লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', পৃ. ৩৮৪)

লোকসাহিত্যের অনুষঙ্গ প্রয়োগ

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ এ সংকলনের বিশেষ সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য প্রবাদ-প্রবচনের প্রসঙ্গ। এর ব্যবহার বাঙালির মননে

পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুগ যুগ ধরে লোকমানসের সচেতন-অবচেতনে পুঞ্জীভূত এসব প্রবাদ-প্রবচনকে প্রাত্যহিক জীবনে হরহামেশা ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত। এর মাধ্যমে ভাষায় নতুন মাত্রারোপ প্রদান ও অর্থদ্যোতকতার সংযোজন ঘটে। ফলে গতানুগতিক, তুচ্ছ, সাধারণ বক্তব্যও পাঠক-শ্রোতার নিকট স্বতন্ত্র আবেদন সঞ্চারে সক্ষম হয়। এ গ্রন্থে প্রাবন্ধিকের প্রবাদ-প্রবচনের বিবিধ প্রয়োগের মূলে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো — সাধারণ মানুষের নিকট রচনার বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন। কেননা, বক্তব্যের আবেদনকে সম্প্রসারিত করতে প্রবাদ-প্রবচনের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা।

ক. প্রচলিত প্রবাদের ব্যবহার

১. এদের কাছে বাবা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নাই। ('লাট- প্রেমিক আলি ইমাম', পৃ. ৪১৬)
২. এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, ('মুখবন্ধ', পৃ. ৪০০)
৩. কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী! ('কালা আদমিকে গুলিমারা', পৃ. ৪১১)

খ. আংশিক পরিবর্তনজাত প্রবাদের ব্যবহার

১. স্বদেশি জিনিসের সওদা লইয়া দেশময় একটা হৈহৈ ব্যাপার, রৈরৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল, ('জাতীয় শিক্ষা', পৃ. ৪২৩)
২. জাতীয় বিদ্যালয়ে কাঁচা কাঁচা অধ্যাপক নিয়োগ লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা হাজার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না; 'মাছ দিয়া শাক ঢাকা যায় না।' ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', পৃ. ৪২৫)

গ. ধারাবাহিকভাবে প্রবাদের ব্যবহার

১. তোমার মন্ত্রে যদি ভূত না ছাড়ে, তবে সে তোমার দোষ বা ক্ষমতার অভাব, তাহা মন্ত্রের দোষ নয়। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা বলিয়া আক্ষেপ করা — ধৃষ্টতা আর বোকামি মাত্র। ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', পৃ. ৪২৬)
২. লর্ড সিংহ বাহাদুর চুপ করিয়া ভাবিতেছেন,'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি'। তিনি এখনো প্রাণপণে দু' নৌকায় পা দিয়া আছেন বলিলেই হয়। ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', পৃ. ৪২৬)

ঘ. তৎসম প্রবাদ

১. আর এ 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব চলিবে না। ('শ্যাম রাখি না কুল রাখি', পৃ. ৪১৩)
২. 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম', ভুল সকলেরই হয়; ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', পৃ. ৪২৫)

ঙ. উপমাশ্রিত প্রবাদ

গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো তদুপরি আবার আমাদের একগুঁয়েমিও আছে। ('জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', পৃ. ৪২৫)

বাংলা শব্দভাণ্ডারে সংরক্ষিত বিচিত্র প্রবচনকে এ সংকলনে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন — জগদ্দল শিলা, টুঁটি টিপে ধরা, জাঁতায় পিষ্ট করা, পোঁ ধরা, গায়ের ঝাল আর রসনার চুলকানি মেটানো, নাম ভাড়ানো, হজম করা, টীকাটিপ্পনী কাটা, শূলের মতো বাজা, উঠে পড়ে লাগা,

মাটি করে ফেলা, বুটের ঠোক্কর, মরণ-কামড়, খোঁচা খাওয়া, গড্ডলিকা প্রবাহ, দণ্ডমুণ্ড, হর্তাকর্তা, অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরানো, অশ্বডিম্ব, চড়কগাছ, কর্ণপাত, বিপদভঞ্জন মধুসূদন প্রভৃতি।

একই বাক্যে একাধিক প্রবচনের প্রয়োগ —

যত ছোঁয়াছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বকধার্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই।
('ছুঁৎমার্গ', পৃ. ৩৯২)

বাংলা ও আরবি লোককথা-উপকথার অনুষঙ্গ ব্যবহার —

১. নির্বোধ মেষ যূথের মতো এক স্থানে জড়ো হইয়া শুধু মাথাটা লুকাইয়া থাকিলে নেকড়ে বাঘের হিংস্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইব না, তাহা হইলে আমাদের ঐ নেকড়ে বাঘের মত করিয়া কান ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবে।
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৬)

২. সাহিত্যকে এই প্রাণের সোনার কাঠি দিয়া জাগাইবার যে জাদু-শক্তি,
('বাংলা সাহিত্যে মুসলমান', পৃ. ৩৮৯)

৩. তাহারা 'ঐ রে চিচিং ফাঁক হলো বলিয়া ...মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা পায়।
('মুখবন্ধ', পৃ. ৩৯৯)

লোকছড়া ব্যবহার —

অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়, সাপের মাথায় যেন ব্যাঙে প্রহারয়!
('শ্যাম রাখি না কুল রাখি', পৃ. ৪১৩)

সুভাষিত উক্তি —

ক. শক্তি সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারেই বৃদ্ধি, অন্যায় অপচয়ে তাহার লয়।
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৫)

খ. দুঃখের দিনেই প্রাণের মিলন সত্যিকার মিলন হয়। ('ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', পৃ. ৩৮১)

গ. লেখকের লেখা হইতেছে তাহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি।
('বাংলা সাহিত্যে মুসলমান', পৃ. ৩৮৯)

কবিতা ও সংগীতের অনুষঙ্গ প্রয়োগ —

ক. পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি! ('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)

রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীর 'কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনোতো'— চরণের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ ব্যবহার —

খ. কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা কখনো নয়,
('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ!', পৃ. ৩৭৮)

বক্তব্যকে গতিময়, জোরালো ও উদ্দীপ্তভাবে পাঠকের নিকট তুলে ধরতে তিনি কখনো কখনো জ্ঞানদাস রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর অংশবিশেষ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেছেন —

ক. বাস্তবিক এখন এই রাজতন্ত্র ওরফে আমলাতন্ত্র মশাইয়ের 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!' ('মুখবন্ধ', পৃ. ৩৯৮)

খ. শ্রীমধুসূদন প্রসন্ন হইয়া ক্রমেই ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া পড়িতেছেন: কি গেরো! 'সখি হে, কি মোর করমে লিখি?' ('মুখবন্ধ', পৃ. ৩৯৯)

রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশের ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন — 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের প্রারম্ভে —

হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাহাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। ('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', পৃ. ৩৯৫)

কবিতা ও প্রবন্ধের সাদৃশ্য

নজরুলের প্রাবন্ধিক সত্তার সঙ্গে তাঁর কবিসত্তার অদ্বৈত মিলন *যুগবাণী* সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের সুচিন্তিত মন্তব্য —

নজরুল ইসলামের কবি-সত্তার টীকাভাষ্য যেন এ প্রবন্ধাবলী।[১৯]

'ছুৎমার্গ' প্রবন্ধে সমাজের জরাজীর্ণতা, শোষণ ও নিপীড়নকে ধ্বংসপূর্বক ভেদাভেদমুক্ত সমাজ গড়ার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য —

আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহনপূত কারাপাহাড়ের দলকে সেই জন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি, এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে, 'আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!' (পৃ. ৩৯২)

এর সঙ্গে তুলনীয় —

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন — জীবন-হারা অ-সুন্দরে কর্‌তে ছেদন!
...
... ...
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

('প্রলয়োল্লাস'/*অগ্নি-বীণা*, *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬-৭)

আধুনিক সভ্যতার বিনির্মাণের মুখ্য স্থপতি শ্রমিক-মজুর শ্রেণির প্রতি সমাজের সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর মনোভঙ্গি নির্দেশ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের অভিমত —

এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো — দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার তোমার কি অধিকার আছে? ...তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি,'ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?' ('উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', পৃ. ৩৯৬)

এর সঙ্গে তুলনীয় —

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

('কুলি-মজুর', *সাম্যবাদী*, *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৪)

প্রবন্ধের শিরোনাম

যুগবাণীর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধের শিরোনাম হিসেবে কখনো ব্যবহৃত হয়েছে কবিতার চরণ–'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'। প্রাবন্ধিক কখনো-বা প্রবন্ধের শিরোনামেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন— 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' ও 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?'। প্রবাদকে প্রবন্ধের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহারের দৃষ্টান্তও রয়েছে 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'। কখনো কখনো প্রবন্ধের শিরোনাম নির্বাচিত হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের চাবুকে জর্জরিত করতে — 'লাট-প্রেমিক আলি ইমাম'। অন্যান্য প্রবন্ধের শিরোনাম নির্দেশের ক্ষেত্রে তিনি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগী। যেমন — 'নবযুগ', 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'ছুঁৎমার্গ' প্রভৃতি।

অনুচ্ছেদ ব্যবহার

প্রবন্ধের মতো মননশীল, যুক্তিনিষ্ঠ গদ্যরচনায় অনুচ্ছেদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রচয়িতাকে লক্ষ রাখতে হয় বক্তব্যকে বাক্যবন্ধের সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে প্রসারিত করতে গিয়ে যেন সুষ্ঠু ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কারণ একাধিক অনুচ্ছেদের সমন্বয়েই একটি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের অভীষ্ট বক্তব্য শিল্পময় বাণীরূপ অর্জন করে। ভাবের প্রবহমানতাকে অনুচ্ছেদের বন্ধনে যথাযথভাবে প্রোথিত করতে নজরুল *যুগবাণী*-র অধিকাংশ প্রবন্ধেই দীর্ঘ অনুচ্ছেদ গ্রন্থনায় মনোযোগী। যেমন — 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য' শীর্ষক স্মৃতিচারণামূলক রচনায় তিনি একটি অনুচ্ছেদেই রচনাকে বেগবান করে তুলেছেন। পাঠক যেন একাগ্র মনোযোগে প্রবন্ধের ভাববস্তুগত ওজস্বিতা ও গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়, সে-কারণে তিনি তাকে যেন ক্ষণকালের বিরতি দিতেও অনাগ্রহী। অন্যদিকে 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধে এক পৃষ্ঠার চেয়েও দীর্ঘ পরিসরে প্রথম অনুচ্ছেদ গঠনের পর অবশিষ্ট বক্তব্য মাঝারি আকৃতির দুটি অনুচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন' শীর্ষক বিজ্ঞানধর্মী প্রবন্ধে তিনি এক বাক্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ ব্যবহারের পাশাপাশি কখনো চার বাক্যে, আবার কখনো-বা দশ বাক্যের সমন্বয়ে মাঝারি আকৃতির অনুচ্ছেদ সৃষ্টি করেছেন, যেখানে কোনো দীর্ঘ অনুচ্ছেদই স্থান পায়নি। যথা —

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খুব সরু লম্বা ঘৃণ্য সরীসৃপ জাতিও — যেমন কি কেঁচো সাপ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আবার আমাদের ঢিপেয় রাজত্ব করিবে।
যদি মানবজাতি বর্তমানের এই অনিষ্টকারী কয়লার মহা-খরচা ছাড়িয়া দেয় (শুধু কয়লা জ্বালানোর জন্যই বৎসরে ১৬০০ মিলিয়ন টন অম্লজান বাষ্প নষ্ট হইতেছে।) এবং তৎপরিবর্তে ইলেকট্রিক দিয়া কয়লার কাজ চালাইয়া লয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার আর এক নূতন বিপদের মুখ-গহ্বরে পড়িতে হইবে! অর্থাৎ যেদিকেই যাও, নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ! ...
আচ্ছা ধরুন, যদি বায়বীয় ইলেকট্রিসিটির উপরে বর্তমান অপেক্ষা শত বা সহস্র গুণ ভার চাপানো হয় তাহা হইলে আর কি বসন্তে ফুল ফুটিবে — কচি পাতা গজাইবে? আর কি তবে বর্ষার ব্যাকুল বরিষণ পৃথিবীর বক্ষ সিক্ত করিবে? না গো না! তার বদলে বজ্র পতনই হইবে আমাদের পৃথিবীতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রোজ শত শত বজ্রপাতে পৃথিবী ছিন্নাভিন্না হইয়া যাইবে। একজন ধুরন্ধর উল্কাতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হাঁ হাঁ তাহাই হইবে অবশেষে! কি ভয়ানক! আমাদের এখন উচিত যে, আমরা সবাই মিলিয়া প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া বিশ্বাস করি, ও ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা এবং তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। ঐ যে আমাদের আলোকদাতা সবিতা সুয্যিমামা, — উনি শুধু যে আলো আর উষ্ণতারই সৃষ্টি করেন তা নয়, তিনি ইলেকট্রিক শক্তিরও জনক। আর এই আমাদের একমাত্র মামা যিনি প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় অজানা শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সব দিক সমঝাইয়া চলিবেন। মামা জীবতু। (পৃ. ৪০৩-৪০৪)

প্রকৃত অর্থে, বক্তব্যের বিষয়, প্রবণতা ও স্বরূপ অনুধাবনপূর্বক ভাবকে সেভাবেই ভাষার কাঠামোতে শিল্পমানে উত্তরণ সাধনেই অনুচ্ছেদ নির্মাণের সাফল্য নিরূপিত হয়। এক্ষেত্রে নজরুল যথেষ্ট মনোযোগী। এ সংকলনের অন্যান্য প্রবন্ধ মূলত মাঝারি আকৃতির অনুচ্ছেদে গ্রন্থিবদ্ধ, যাদের আয়তন দশ থেকে বিশ লাইন এবং কমপক্ষে অর্ধ-পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যাপৃত।

সাধু-চলিতের মিশ্রণ

অনেকের বিবেচনায়, নজরুল অসচেতনভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধে সাধু-চলিতের মিশ্রণ বা গুরুচণ্ডালি দোষ ঘটিয়েছেন। যেমন — সাধু রীতিতে রচিত 'নবযুগ' প্রবন্ধে 'এ সুর নবযুগের'— (পৃ. ৩৭৭) বাক্যাংশের অন্তর্গত 'এ' সামীপ্যবাচক সর্বনামের প্রকৃত রূপ হবে 'এই'। অন্যত্র একই বাক্যে ক্রিয়ার সাধুরূপ বজায় থাকলেও সর্বনামের চলিতরূপের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় —

ভারত যেদিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল।
('নবযুগ', পৃ. ৩৭১)

অবশ্য ধ্বনিমাধুর্যের তথা শ্রুতির দাবি মনে রাখলে উল্লিখিত তথাকথিত 'ত্রুটি' ধোপে টেকে না। বিশেষণ ও ক্রিয়ার বাহুল্য প্রয়োগ, কখনো কখনো বক্তব্যের অযৌক্তিক প্রসারণ ও পুনরাবৃত্তি, অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার, ভাষার সংযমী বিন্যাসের পরিবর্তে ভাবাবেগের অতিরিক্ত প্রশ্রয়দান প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধসমূহের শিল্পমানকে কিছুটা দুর্বল করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত —

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। প্রমথ চৌধুরী প্রথম এই সরে আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ নজরুল। অস্থির

> এলোমেলোমি...তার লেখায়, তার সমস্ত জীবনযাপনে ছড়িয়ে ছিল। বন্যার তোড়ের মত সে লিখত, চেয়েও দেখত না সেই বেগ-প্রাবল্যে কোথায় সে ভেসে চলেছে। যা মুখে আসত তাই যেমন বলা তেমনি যা কলমে আসত তাই সে নির্বিবাদে লিখে যেত। স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতার জন্য বিচার করে দেখত না বর্জন-মার্জনের দরকার আছে কিনা, পুনর্বিবেচনায় সে অভ্যস্ত নয়। যা বেরিয়ে এসেছে তাই নজরুল, 'কুবলা খান'-এ যেমন কোলরিজ।[২০]

নজরুলের প্রবন্ধের ভাষারীতি ও গদ্যভঙ্গি সম্পর্কে সমালোচকের সুচিন্তিত অভিমত *যুগবাণী*-র আঙ্গিক বিবেচনার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক, তাৎপর্যপূর্ণ—

> কাগজের পূর্ব-নির্ধারিত সীমার মধ্যে রচনাগুলিকে সমাপ্ত হতে হয়েছে। যথাসময়ের মধ্যে লিখিত হওয়ায় অধিকাংশ প্রবন্ধে অতি দ্রুততার চিহ্ন বর্তমান। প্রবন্ধগুলির আঙ্গিক অবিন্যস্ত। বুদ্ধিবৃত্তি বা মননশীলতার পরিচর্যার অভাবে রচনাগুলির বক্তব্য ও উপস্থাপন অতিমাত্রায় ভাবালুতা আক্রান্ত। অতিশয়োক্তি, উপমা, রূপক-উৎপ্রেক্ষার অতি ব্যবহারে ...অপরিমিত বিশেষণ প্রয়োগে ...বাক্যগঠনেও ত্রুটি দুর্লক্ষ্য নয়। ...প্রবন্ধগুলির স্বভাবজ লক্ষ্য প্রচারধর্মিতাও অনেক সময় কার্যকারণহীনতায় পীড়িত। ...
>
> ভাবাবেগ, উদ্দাম-ভাবালুতা নজরুলের গদ্যের দুর্বলতার দিক ঠিকই, তবে এটা তাঁর গৌরবেরও কারণ। ভাবাবেগই নজরুলের গদ্যরচনাকে রক্ষা করেছে, বহুলাংশে। আবেগাক্রান্ত পৌরুষ-ঋদ্ধ গদ্য হিসেবে নজরুলের প্রবন্ধগুলি প্রশংসনীয়। বাঙলা গদ্যে এরূপ বেগের সঞ্চার অতি স্বল্প প্রতিভার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ...আবেগসঞ্চারী প্রাণময় পৌরুষঋদ্ধ গদ্যরচয়িতা হিসেবে নজরুল ইসলামের প্রবন্ধগুলি আজো অনতিক্রমণীয়।[২১]

যুগবাণী সংকলনে নজরুলের উদ্দীপ্ত আবেগোচ্ছ্বাস, সূক্ষ্ম সমাজদৃষ্টি, রাজনৈতিক সচেতনতা, মানবতাবাদী-উদারনৈতিক জীবনবোধের শিল্পিত অবয়ব বাঙ্ময় হয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ গদ্যরীতির কুশলী বিন্যাসে, ভাব অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ ও শব্দ নির্বাচন, পদসংযোজনা ও বাক্যনির্মাণের অনায়াস পারদর্শিতায়। মননশীল প্রাবন্ধিকের সংহত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিশীলিত শিল্পিমানসের সচেতনতা এ সংকলনে দুর্লভ । তবে, ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ পরাধীন ভারতবর্ষের লাঞ্ছনায় সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক নজরুলের বেদনার্ত-সমবেদনাপূর্ণ মনোভঙ্গি, গণমানুষের প্রতি একাত্মবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার যথার্থ বাহন হয়েছে উক্ত সংকলনটি। তাছাড়া, এ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধসমূহের আবেদন শুধু সাধারণ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল না, পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসকশক্তি ও তার অনুগত শ্রেণির নিকটও ভীতি-আতঙ্কের আবহ সঞ্চার করেছিল। সর্বোপরি, প্রবন্ধগুলো সমকালের অগ্নিস্নাত-বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশে বাংলার বিপ্লবী তরুণসমাজকে শাসকশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষাপূর্বক সংগ্রামের সুদৃঢ় মানসিকতায় বলীয়ান হওয়ার দুর্বার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। নজরুলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় *যুগবাণী* স্বতন্ত্র মর্যাদায় উত্তীর্ণ, প্রাতিস্বিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত।

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (সপ্তম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০০৮, পৃ ৩৭

২. বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৯৭, পৃ. ১৩১

৩. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৭, পৃ. ২৬৬, ২৮৭

৪. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'নজরুলের প্রবন্ধ : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান', *নজরুল সমীক্ষণ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৯, পৃ. ৩৩২

৫. আজহারউদ্দীন খান্, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম সুপ্রীম সংস্করণ : ১৯৯৭, পৃ. ২৬৪-২৬৬, ৩০৩-৩০৪

৬. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, 'নজরুল ইসলাম : গদ্যের উপন্যাস', *নজরুল গদ্য সমীক্ষা*, মুহম্মদ মজিরউদ্দিন (সম্পাদিত), আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৭৮, পৃ. ১, ৫

৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "Introducing Nazrul Islam", মুহম্মদ মজিরউদ্দিন (সম্পাদিত) *নজরুল গদ্য সমীক্ষা*, উদ্ধৃত — গ্রন্থের প্রারম্ভ অংশ, পৃ. গ

৮. মুহম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুলের ভাষা বিদ্রোহ : প্রস্তাবনা', 'নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা'–বিশেষ সংখ্যা, মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০০১, পৃ. ৫০২

৯. মোবাশ্বের আলী, 'প্রাবন্ধিক নজরুল', *নজরুল প্রতিভা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০০০, পৃ. ১৩৭

১০. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, পূর্বোক্ত, গ্রন্থের প্রারম্ভ অংশ, পৃ. ক

১১. সৈকত আসগর, *নজরুলের গদ্যরচনা : ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৯০, পৃ. ৩১

১২. উদ্ধৃত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, আজহারউদ্দীন খান্, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১৩. মোবাশ্বের আলী, 'বাংলা গদ্য এবং নজরুল', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

১৪. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'নজরুল কবিতায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত', 'নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা'-বিশেষ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১১

১৫. মুজফফর আহমদ, 'কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিকথা', উদ্ধৃত, সুশীলকুমার গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

১৬. *যুগবাণী* সংকলনের গদ্যরীতি ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূল প্রবন্ধের (*যুগবাণী*) সকল উদ্ধৃতির উৎস–কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০০৬। পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা উদ্ধৃতির পার্শ্বস্থিত অংশে নির্দেশিত হবে। 'কুলি-মজুর' কবিতার উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য–*নজরুল রচনাবলী*, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল : ২০০৭।

১৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'দূরের আবার কাছেরও কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ', 'একবিংশ', নজরুল জীবনানন্দ সংখ্যা, খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সম্পাদিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭৫

১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংশোধিত সংস্করণ: ১৯৯১, পৃ. ২৩৬

১৯. সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২

২০. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, দশম প্রকাশ : ১৪১৬, পৃ. ৪৭-৪৯

২১. সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯